লাভজনকভাবে

ক্ষুদ্র খামারে

হাঁস পালন

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২২

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ক্ষুদ্র খামারে হাঁস পালনের উদ্দেশ্য

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা।
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
- হাঁসের ডিম এবং বাড়ন্ত হাঁস বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে।

হাঁস খামার স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে খামারের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে। কেননা, খামারের ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এই অংশের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এই খরচের শতকরা ৭০ ভাগের অতিরিক্ত হলে খামারে লোকসানের হার বৃদ্ধি পায়। খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হতে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁসের উন্নত জাত ও বৈশিষ্ট্য

খাকী ক্যাম্পবেল

উৎপত্তি স্থানঃ ইংল্যান্ড

বৈশিষ্ট্য ঃ

- পালকের রং খাকী।
- ডিমের রং সাদা।
- ঠোঁট নীলাভ বা কালচে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৫০-৩০০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি।

খাকী ক্যাম্পবেল

জেনডিং

উৎপত্তি স্থান ঃ চীন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং কালো ও সাদা মিশ্রিত
- হাঁসির পালকের রং খাকীর মাঝে কালো ফোঁটা।
- ডিমের রং নীলাভ।
- ঠোঁট নীলাভ বা হলদে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৭০-৩২৫ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি।

জেনডিং

পিকিং

উৎপত্তি স্থান ঃ চীন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৫০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৪.৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি

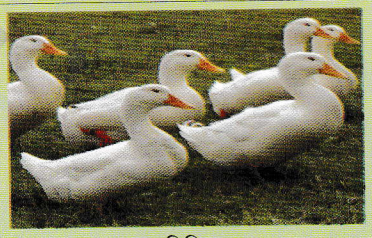

পিকিং

মাসকোভি

উৎপত্তি স্থান ঃ দক্ষিণ আমেরিকা

বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা ও কালো।
- মাথায় লাল ঝুটি।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১২০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি।

মাসকোভি

ইন্ডিয়ান রানার

উৎপত্তি স্থান ঃ ভারত

বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা বা বিভিন্ন রংয়ের মিশ্রণ।
- ডিমের রং সাদা।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৮০ টি।
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি।

ইন্ডিয়ান রানার

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

হাঁস খামার স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে খামারের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে। কেননা, খামারের ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এই অংশের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হতে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্যের উপদান সমূহঃ খাদ্যের মৌলিক উপাদান ৬ ধরণের। যথা ঃ শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ ও পানি। যেমনঃ শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি); আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল ইত্যাদি); চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, ভেজিটেবল অয়েল, কর্ড লিভার ওয়েল ইত্যাদি); ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (শাকসবজি ও কৃত্রিম ভিটামিন); খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন ইত্যাদি); এবং পানি।

দেহের ভিতর শর্করা খাদ্য বিশ্লেষিত হয়ে দেহের তাপ উৎপাদনের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করে। শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান দুই ধরণের। যথাঃ

- **দানাদার ঃ** সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম, যব, কাওন, সরগম, চাউল ইত্যাদি।
- **আঁশ ঃ** সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, তোপিওকা, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা ইত্যাদি।

হাঁসের প্রতি কেজি খাদ্যে সাধারণত ২৭৫০ থেকে ৩০০০ কি.ক্যালরি শর্করা ব্যবহার করতে হয়।

হাঁসের খাদ্যে প্রাণিজ উৎস ও উদ্ভিদ উৎস হতে আমিষ জাতীয় খাদ্য মিশ্রণ করে তৈরী করা হয়ে থাকে। উদ্ভিদ উৎসের খাদ্য হিসাবে সাধারণত সায়াবিন মিল, তিলখৈল, তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি, ডাকউইড, এ্যাজোলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে প্রাণিজ উৎস হতে সাধারণত শুটকি মাছের গুড়া, প্রোটিন কনসেনট্রেট, শামুক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাঁসের খাদ্যে সাধারণত শুরুতে ২০-২২% এবং ৮ সপ্তাহ বয়সের পর থেকে ১৬-১৭% আমিষ ব্যবহৃত হয়। বাড়ন্ত হাঁস পালণে অধিক আমিষ সরবরাহ করলে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি হয়। তবে এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে। সাধারণত মাংস উৎপাদনে হাঁস পালনে অধিক আমিষ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। হাঁসের খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ এর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার গুরুত্ব রয়েছে।

দেহ কোষের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি। খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ অত্যন্ত জরুরী। পানির অভাব হাঁসের

উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা কমায়, দৈহিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত করে, রোগ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের ব্যয় বৃদ্ধি ও লোকসান বৃদ্ধি করতে পারে। পানি খাদ্য বস্তু নরম ও সহজে পরিপাকযোগ্য করে তোলে. খাদ্যের পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ, দেহে উৎপাদিত ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ এবং সর্বোপরি খাদ্য বিশ্লেষণ, বিপাক, হরমোন, এনজাইম ও রক্ত তৈরীতে ভূমিকা রাখে।

বাড়ন্ত হাঁসের খাবারের ফর্মূলা (১০০ কেজি)

খাদ্য উপাদান	পরিমান (কেজি)
গম ভাঙ্গা	৩৬-৩৭
ভূট্টা ভাঙ্গা	১৮
চালের কুড়া	১৭-১৮
সয়াবিন মিল	২২
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২
ঝিনুক গুড়া/লাইম স্টোন	২
ডিসিপি	১.২৫
ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.২৫
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৩০
মোট	১০০ কেজি

ডিমপাড়া হাঁসের খাদ্য তালিকা/রেশন তৈরী (১০০ কেজি)

খাদ্য উপাদান	পরিমান (কেজি)
গম ভাঙ্গা	৩৭
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৬
চালের গুড়া	১৭
সয়াবিন মিল	২৩
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২
ঝিনুক গুড়া	৩.৫
ডিসিপি	০.৭৫
ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.২৫
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৩০
মোট	১০০ কেজি

হাঁসের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে। যে সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো

দিন	টিকা
২১-২৮ দিন	ডাক প্লেগ
৩৫-৪২ দিন	ডাক প্লেগ বুস্টার, তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর বুস্টার
৪৫-৬০ দিন	ডাক কলেরা
১৪ দিন পর	ডাক কলেরা বুস্টার তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর বুস্টার
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে ইডিএস, আইএলটি, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

খামারে সপ্তাহে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।

- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়

হাঁস তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামরের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমন), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

ব্রুডার নিউমোনিয়া

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।
- বাচ্চা হাঁস একত্রে জড়ো হয়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

করণীয় ঃ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।
- লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক মুক্ত হতে হবে।

ডাক কলেরা

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত সেপটিসেমিক রোগ। পাস্টুরেলা মালটোসিডা টাইপ এ জীবাণু সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ সবুজ বা হলুদ ডায়েরিয়া। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অধিক মৃত্যুহার।

করণীয় ঃ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ সঠিক সময়ে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস

রোগের লক্ষণ ঃ

- সবুজ পায়খান, চোখ বন্ধ করে রাখে, বসে থাকে ও স্নায়বিক বৈকল্য।
- অধিক মৃত্যু হার।

করণীয় ঃ এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ টিকা প্রদান করতে হবে। ৩-১১ সপ্তাহ বয়সে ১ম টিকা এবং ৪ সপ্তাহ পর বুস্টার টিকা প্রদান করতে হবে।

বটোলিজম ঃ ইহা ক্লোস্ট্রিডিয়াল টক্সিনজনিত একটি রোগ। খাদ্য সংরক্ষণ সঠিক না হলে খাদ্যে প্রোটিন জাতীয় অংশে এনারোবিক কন্ডিশনে ক্লোসট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয়া/বটোলিনাম নামক টক্সিন তৈরী করে। এই টক্সিন হাঁসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণত চিটাগুড় ও পর্যাপ্ত স্যালাইন সরবরাহের মাধ্যমে এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব হয়ে থাকে।

কৃমিজনিত সমস্যা ঃ হাঁসে কৃমি জনিত রোগ প্রায়শই দেখা যায়। সাধারণত গোলকৃমি (এসকারিয়াসিস), গেপ ওয়ার্ম, টেপ ওয়ার্ম জাতীয় কৃমি সংক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

চিত্রে হাঁসের রোগ

ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস রোগের লক্ষণ

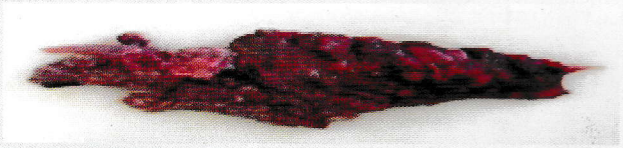

ব্রুডার্স নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হাসের ফুসফুস

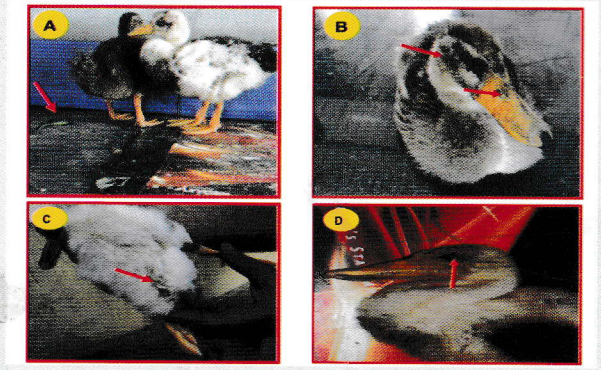

ডাক প্লেগ রোগের লক্ষণ

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।